স্বাধীনতা সংগ্রামে খুলনা

অজিত কুমার নাগ

সম্পাদনা

বিভূতিভূষণ মণ্ডল

স্বাধীনতা সংগ্রামে খুলনা
অজিত কুমার নাগ
সম্পাদনা : বিভূতিভূষণ মণ্ডল

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২১

প্রকাশক
কবি প্রকাশনী
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

বাংলাদেশে পরিবেশক
গ্রাজুয়েট বুক স্টল বিএল কলেজ গেট দৌলতপুর খুলনা
ফোন : ০১৯৩৯-১১৭১১৭

ভারতে পরিবেশক
অভিযান পাবলিশার্স ১০/২ এ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট কলকাতা

মূল্য: ২৫০ টাকা

Swadhinata Songrame Khulna by Ajit Kumar Nag Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market Kantabon Dhaka 1205 First Kobi Prokashani First Edition: March 2021
Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 Phone: 02-9668736
Price: 250 Taka Rs: 250 US 10 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-94933-7-2

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

জানা ও অজানা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের
স্মৃতির উদ্দেশে

সম্পাদকের ভূমিকা

> বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই। কে লিখিবে? তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। যে বাঙ্গালী, তাহাকেই লিখিত হইবে। মা যদি মরিয়া যান, তবে মা'র গল্প করিতে আনন্দ। আর এই আমাদের সর্বসাধারণের মা জন্মভূমি বাঙ্গালা দেশ, ইহার গল্প করিতে কি আমাদের আনন্দ নাই? আইস, আমরা সকলে মিলিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসের অনুসন্ধান করি।
>
> —বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ভারতবর্ষ যেমন বৃহৎ একটি দেশ তার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসও তেমনি ঘটনাবহুল। বিপুল বৈচিত্র্যে ভরা। একটি দেশের জাতীয় ইতিহাসের খণ্ডিত রূপ হলো আঞ্চলিক ইতিহাস। আবার কথাটি এভাবেও বলা যেতে পারে, আঞ্চলিক ইতিহাসের যোগফল কিংবা সমন্বিত রূপ হলো জাতীয় ইতিহাস। জাতীয় ইতিহাসে কখনো কখনো আঞ্চলিক ইতিহাস উপেক্ষিত থেকে যায়। তাছাড়া জাতীয় ইতিহাসের রচয়িতাগণ সাধারণত দেশের কেন্দ্রে বা রাজধানী শহরে অবস্থান করেন বলে তাদের অনুসন্ধানী দৃষ্টি আঞ্চলিক পরিধিতে তথা প্রত্যন্ত প্রান্তরে নাও পড়তে পারে, এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তা পড়েও না। কখনো কখনো আবার এইসব ইতিহাস-রচয়িতাদের মধ্যে এক ধরণের উন্নাসিকতা কাজ করে যার ফলে তারা ওইদিকে গুরুত্ব দেবার তাগিদ বোধ নাও করতে পারেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দুইটি বিষয় লক্ষ্য করা যায়। একটি হলো, স্বাধীনতা সংগ্রাম কখনো কখনো দেশের একটি প্রান্ত থেকে শুরু হয়ে কেন্দ্রগামী হয় এবং গোটা দেশকে আন্দোলিত করে। আরেকটি হলো, রাজধানী শহর থেকে শুরু হয়ে, কেন্দ্র থেকে বৃত্ত তৈরি হবার মতো, আন্দোলনটি গোটাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। গোটা দেশের সিংহভাগ মানুষ এই আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা সাধারণ মানুষকে এই আন্দোলনে শামিল করে স্বাধীনতা সংগ্রামকে একটি গণআন্দোলনে পরিণত করেন। এই গণআন্দোলনের গণমানুষ স্বাধীনতা লাভের পর কখনো কখনো ব্রাত্য হয়ে পড়েন। তাদের আন্দোল-সংগ্রাম-ত্যাগ-তিতিক্ষা সামগ্রিক বিচারে গৌণ হয়ে পড়ে, তারা উপেক্ষারও শিকার হন। সুতরাং জাতীয় ইতিহাস হয়ে পড়ে খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ এবং পক্ষপাতদুষ্ট। যে-কোনো আন্দোলনে গণমানুষের ভূমিকা মূল্যায়ন করতে গেলে আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার বিকল্প নেই। পাশাপাশি যথাসময়ে ইতিহাসের উপাদান

সংরক্ষিত এবং ইতিহাস রচিত না হলে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-উপাত্ত হারিয়ে যায়, বিকৃত হয়ে যায়, বিজয়ীরা পরাজিতদের ইতিহাস নষ্ট করেও দেয়; ফলে ইতিহাস সত্যমিথ্যার অমীমাংসিত চোরাবালিতে আটকে পড়ে। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মৃত্যু ঘটলে প্রত্যক্ষভাবে তথ্য যাচাইয়ের অনেক সুযোগও চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যায়। দীর্ঘসময় পেছনে ফেলে এসে ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহ ধারাবাহিকভাবে বিবৃত করাও কখনো কখনো জটিল হয়ে ওঠে। সুতরাং সময়ের ইতিহাস সময়মতোই লিপিবদ্ধ হওয়া জরুরি। তবে ইতিহাসের মূল্যায়ন করতে এবং ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে গেলে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতেও হয়। বিলম্বে হলেও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তৎকালীন একটি মহকুমা শহরের অবদানকে চিহ্নিত করার জন্য, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম ছাত্রকর্মী শ্রীঅজিতকুমার নাগ 'স্বাধীনতা সংগ্রামে খুলনা' (১৯৮৪) বইটি রচনা করে, ইতিহাসের দায় পালন করে, খুলনাকে গৌরবদান করে, আমাদের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন।

যে-কোনো দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের আঞ্চলিক ইতিহাস, বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর মতো, জাতীয় ইতিহাসের গুরুত্ব এবং তীব্রতা ধারণ করে। কেননা, আঞ্চলিক ইতিহাস জাতীয় ইতিহাসের একটি সংস্করণ বা ক্ষুদ্র রূপ হলেও জাতীয় ইতিহাসে যা কিছু ঘটে সেগুলোর ছাপ বা প্রভাব আঞ্চলিক ইতিহাসেও পড়ে। আবার উল্টো দিক দিয়ে বিচার করলে বলা যায়, আঞ্চলিক ইতিহাসও জাতীয় ইতিহাসকে প্রভাবিত করে, নির্মাণ করে। 'স্বাধীনতা সংগ্রামে খুলনা' বইটি একটি আঞ্চলিক ইতিহাস-গ্রন্থ হলেও বৃহৎ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের চেহারাটিও এই বইতে যথেষ্ঠভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

কোনো দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম একদিনে দানা বেঁধে ওঠে না, চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে না। এই সংগ্রামকে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। একটি আগ্নেয়গিরি বিস্ফোরণের পূর্বে তার গহ্বরে সঞ্চিত তেল গ্যাস লাভা তাপ ও চাপে আন্দোলিত হয়ে নির্গমনের পথ খোঁজে। কোনো পথ না পেয়ে ভূ-ভাগে ধাক্কা মারতে থাকে। নিজেই পথ তৈরির চেষ্টা করে। তারপর একসময় ঘটে নির্গমন। অনুরূপভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামের চরম প্রকাশের পূর্বে একটি প্রস্তুতিপর্ব চলতে থাকে। নানারকম ঘটনা ও কারণ অনুঘটক এবং প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। আগ্রাসী শাসকগোষ্ঠীর আগ্রাসন এবং দমন-পীড়নে মানুষ যখন হাঁফিয়ে ওঠে, বুক ভরে মুক্তির নিঃশ্বাস নিয়ে বাঁচতে চায় অথচ বাঁচতে পারে না তখন তাদের ক্ষোভের চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটে নানারকম প্রতিবাদ, প্রতিরোধ এবং সংগ্রামী কর্মসূচির মাধ্যমে। বিভিন্ন ইস্যুতে তারা সংগঠিত হতে থাকেন। ভারতবর্ষে শাসনব্যবস্থা কায়েমের পর ভারতীয়দের জন্য ইংরেজরা কিছু কিছু হিতকর কাজ করলেও, অবশ্য এসব পরিকল্পনার কোনো কোনোটির সাথে ভারতীয়দের তুলনায় নিজেদের সুবিধাভোগের স্বার্থ জড়িত ছিল বেশি, তাদের গৃহীত কিছু কিছু রাজনৈতিক রীতিনীতি, শাসনব্যবস্থা, বৈষম্যমূলক আচরণ ভারতীয়দের ক্ষুব্ধ করে।

ফলে ভারতীয়দের মধ্যে স্বাধীনতার স্পৃহা জাগতে থাকে। যে-কোনো আন্দোলন চরম এবং সশস্ত্র হয়ে ওঠার আগে সেটি থাকে একটি ভাব-আন্দোলন তথা বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন। অর্থাৎ বক্তৃতা-বিবৃতি, প্রচারপত্র এবং সংবাদপত্রকে ঘিরেই এই আন্দোলনের প্রাক্-প্রস্তুতি শুরু হয়। শুরু হয় শাসকগোষ্ঠীর সাথে আলাপ-আলোচনা—যাকে দেনাপাওনার মতো দরকষাকষি বললেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু দরকষাকষি করে কখনো স্বাধীনতা আসে না। তেমনিভাবে আসেওনি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রস্তুতিপর্বে দেখা দেয় দেশাত্মবোধের উন্মেষ। বিশেষত ইউরোপীয় চিন্তা, দর্শন ও রেনেসাঁসের আলোয় আলোকিত নব্য বাঙালিদের মধ্যে যে নবজাগরণ ঘটে তার সাথে সংশ্লিষ্ট নানান অনুষঙ্গের বিকাশ প্রকাশ উদ্ভাবন নির্মাণ গঠন—খুলনার চেতনাপ্রবাহকেও প্রভাবিত করে। এই নবজাগরণে বড়ো একটি ধর্মীয় সংস্কার ঘটে রাজা রামমোহন রায়ের (১৭৭২-১৮৩৩) ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলনের মাধ্যমে। অজিতকুমার নাগ নিজেই লিখেছেন : 'এতদিন ধর্ম ও শাস্ত্রের অনুশাসন মানুষের মন ও বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। সমাজচেতনা ছিল নির্জীব। এই দুই আন্দোলনের ঘাতপ্রতিঘাতে মানুষের মনে নানা প্রশ্ন ওঠে, সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি হয়।' ভারতবর্ষের নবজাগরণের সন্তান যারা তাদের মধ্যে দু'জন গুরুত্বপূর্ণ মানুষের আগমন ঘটেছিল খুলনার বুকে। তখনকার খুলনা বলতে খুলনা-বাগেরহাট-সাতক্ষীরাকে একসাথে বোঝানো হতো। ডিরোজিওর ছাত্রদের অন্যতম, মাইকেল মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-১৮৭৩) সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু গৌরদাস বসাক (১৮২৬-১৮৯৯) এসেছিলেন বাগেরহাট মহকুমার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) এসেছিলেন খুলনার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে এবং বঙ্কিমচন্দ্রের সহোদর বিখ্যাত 'পালামৌ' বইয়ের লেখক সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৪-১৮৯৯) এসেছিলেন সাতক্ষীরার স্পেশাল সাব-রেজিস্ট্রার হয়ে। পরস্পর পাশাপাশি তিনটি মহকুমায় এই তিনজন গুরুত্বপূর্ণ মানুষের প্রভাবে নবজাগরণের উন্মেষ ত্বরান্বিত হয়েছিল নিঃসন্দেহে। এই প্রসঙ্গে, খুলনা শহরের রূপকার, খুলনার সিভিল সার্জন অরবিন্দ ঘোষ এবং বারীন ঘোষের বাবা, ডা. কৃষ্ণধন ঘোষের নামও স্মরণীয়। এছাড়া খুলনার দুই কীর্তিমান ভূমিপুত্র আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় (১৮৬১-১৯৪৪) এবং ত্রিগুণাচরণ সেন খুলনা তথা অখণ্ড বাংলার জাতীয়তাবাদী চেতনার অন্যতম ধারক বাহক ছিলেন। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার আগে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে যেগুলো স্বাধীনতা আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করে। প্রথমটি বঙ্গভঙ্গ এবং দ্বিতীয়টি স্বদেশি আন্দোলন। ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর বঙ্গদেশকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা তথা এই দুই সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে বিরাজমান সম্প্রীতির ঐক্য নষ্ট করার কূটকৌশল হিসেবে ব্রিটিশ রাজ বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা করে। বাংলার নেতারা এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানান, ৬০ হাজার

গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করে ইংল্যান্ডে কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠান। বঙ্গভঙ্গ কার্যকরী হওয়ার আগে ১৯০৫ সালের মে মাসে ময়মনসিংহে প্রাদেশিক কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন বসে। এই অধিবেশনে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই সম্মেলনে খুলনা থেকে ৮ জন প্রতিনিধি যোগদান করেন। ১৯০৫ সালের জুলাই মাসে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ আন্দোলন শুরু হয়। বিলেতি পণ্য বর্জন এবং স্বদেশি পণ্য ব্যবহারের সংকল্প গ্রহণের যে আন্দোলন শুরু হয় সমগ্র ভারতবর্ষে, সেই আন্দোলনে সাড়া দিয়ে ১৯০৫ সালের ১৬ জুলাই বাগেরহাট শহরে এক জনসভায় বিলেতি পণ্য বর্জনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। বাংলার এই ক্রান্তিলগ্নে কর্তব্য নির্ধারণের জন্য ১৯০৫ সালের ৭ আগস্ট কলকাতার টাউন হলে নেতৃবৃন্দ যে সভা আহ্বান করেন সেই সভায় খুলনার ৫ জন প্রতিনিধি যোগদান করেন। এছাড়াও কলকাতায় পাঠরত খুলনার ৮ জন ছাত্রও এই সভায় অংশগ্রহণ করে জাতীয় ইতিহাসের অংশ হয়ে আছেন।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম পর্ব মূলত স্বদেশি আন্দোলন। স্বদেশি আন্দোলনের সমর্থনে ১৯০৫ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর খুলনায় প্রথম যে-সভাটি অনুষ্ঠিত হয় সেই সভায় যোগদান করতে এসেছিলেন মুকুটবিহীন সম্রাট রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৮-১৯২৫)। স্বদেশি চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ১৯০৫ সালের ১৪ নভেম্বর সেনহাটী উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় এবং দৌলতপুর হিন্দু একাডেমির (বর্তমান ব্রজলাল কলেজ) ছাত্ররা মিলে দৌলতপুর বাজারে হানা দিয়ে বিলেতি পণ্য রাস্তায় ফেলে দেয়, বিলেতি কাপড় স্তূপ করে আগুনে পুড়িয়ে দেয়। ১৯০৬ সালের ১৪ এবং ১৫ এপ্রিল বরিশাল শহরে যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাতে খুলনার ৩ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনের নির্বাচিত সভাপতি ব্যারিস্টার আবদুল রসুল সস্ত্রীক এই সম্মেলনে যোগদানের পথে খুলনায় যাত্রা বিরতি করেন। বরিশাল কনফারেন্স থেকে ফিরে এসে খুলনার প্রতিনিধিগণ খুলনা এবং বাগেরহাট শহরে স্বদেশি সভা করে সাধারণ জনগণকে সচেতন করেন এবং বিশেষত হিন্দু-মুসলমান ঐক্য ধরে রাখার আহ্বান জানান। স্বদেশি আন্দোলনের সাথে যে-কোনো সংশ্লিষ্টতা প্রমাণিত হলে শিক্ষাসংক্রান্ত সকল সুযোগ সুবিধা প্রত্যাহারসহ ছাত্রদের ছাত্রত্ব বাতিল করা হবে—এই মর্মে সরকার 'কার্লাইল সার্কুলার' নামে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করলে খুলনার ছাত্ররা এই ঘোষণাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে, ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিত্যাগ করে স্বদেশি আন্দোলনে শামিল হন। স্বদেশিরা তখন বিভিন্ন জায়গায় জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং ছাত্ররা এই সব প্রতিষ্ঠানে এসে ভর্তি হন। খুলনার এমন একটি বিদ্যালয় হলো সেনহাটী জাতীয় বিদ্যালয়। এই প্রসঙ্গে অজিতকুমার নাগ লেখেন :

> কার্লাইল সার্কুলার বাঙালির জীবনে শাপে বর হয়ে ওঠে, কারণ এই বিজ্ঞপ্তির প্রতিক্রিয়ায় জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী ও সমাজসেবীরা বিভিন্ন স্থানে

> জাতীয় বিদ্যালয়, স্বদেশী বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে তোলার কাজ শুরু করেন। সারা বাংলাদেশেই এই প্রবাহ সক্রিয় হয়, খুলনা তার ব্যতিক্রম নয়, বরং অন্যতম অগ্রদূত।

সেনহাটী জাতীয় বিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হীরালাল সেন স্বদেশি চেতনা প্রচার করার জন্য 'হুংকার' নামে একখানি কাব্য রচনা করেন। কাব্যখানা তিনি উৎসর্গ করেন রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১-১৯৪১) নামে। বইটির বক্তব্য ছিল ইংরেজ বিরোধিতা এবং ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনের আহ্বান। মূলত 'হুংকার' নামটিই কাব্যের তাৎপর্য বহন করে। ব্রিটিশ সরকার বইটি বাজেয়াপ্ত করে এবং হীরালাল সেনের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলা হয়। কাব্যটি রবীন্দ্রনাথের নামে উৎসর্গ হওয়ায় ব্রিটিশ সরকার জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রবীন্দ্রনাথকে খুলনার আদালতে হাজির হতে বলে। মামলার সাক্ষ্য দিতে রবীন্দ্রনাথ খুলনায় আসেন। রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৯২-১৯৮৫) তাঁর 'ফিরে ফিরে চাই' (মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৩৯৪) গ্রন্থেও প্রসঙ্গটি উল্লেখ করেছেন।

স্বদেশি আন্দোলনের যুগে স্বদেশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্মাণ, শিক্ষাবিস্তার এবং শিল্প কলকারখানা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন খুলনার এক কৃতী সন্তান বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। ১৯১০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার ই বেকার (ছোটলাট) খুলনা সফরে এসে জেলাবোর্ড ও মিউনিসিপ্যালটির সদস্যদের সাথে আলোচনায় বসলে এই দুই সংস্থার পক্ষ থেকে তাকে উন্নয়ন পরিকল্পনা পেশ করার প্রস্তাব দিলে তিনি প্রসঙ্গ এড়িয়ে খুলনার রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা শুরু করেন। তার ইংরেজি বক্তব্য যা ২৫ ফেব্রুয়ারি 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তা পাঠ করে ব্রিটিশ সরকার বিচলিত হয়ে পড়ে। লেখকের ভাষায় :

> আসলে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে খুলনা জেলায় গণঅভ্যুত্থান ঘটে যায়। এই আন্দোলনে হিন্দু-মুসলমান, ধনী-গরীব সমাজের সকল স্তরের মানুষ, এমনকি অসূর্যস্পর্শা অন্তঃপুরবাসিনীরাও এই আন্দোলনে সামিল হন। বাংলার রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপের আলোর সামনে এই প্রথম এসে দাঁড়ায় খুলনাবাসী।

সময়ের সাথে সাথে, নানাবিধ ঘটনার ভেতর দিয়ে স্বদেশি আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। আন্দোলনকে আরও বেগবান করার জন্য ১৯০৬ সালে খুলনায় আসেন বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৮০-১৯১৫) ওরফে বাঘা যতীন। তখন খুলনার বিভিন্ন গ্রামে অনুশীলন সমিতির সংগঠন ছিল। স্বদেশি আন্দোলন চলাকালে ১৯০৭ সালে খুলনায় আরেকটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা ঘটে। এই সালের ২৫ ও ২৬ মে খুলনার স্বদেশি নেতৃবৃন্দ একটি রাজনৈতিক সম্মেলন আয়োজনের ঘোষণা দিলে শান্তিভঙ্গের আশংকায় জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট ১৫ মে একটি সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি করে সম্মেলন বন্ধের নির্দেশ দেন। ম্যাজিস্ট্রেটের এই অবৈধ এবং অগণতান্ত্রিক আদেশের বিরুদ্ধে সম্মেলনের নেতৃবৃন্দ কলকাতা হাইকোর্টে আপিল করলে ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ বাতিল হয়ে যায়। এতে ম্যাজিস্ট্রেট ক্ষিপ্ত হয়ে আরেকটি আদেশ জারি করে সম্মেলনের দিনে শহরে মিছিল

বের করার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। সম্মেলনের দিনগুলিতে একজন পদস্থ অফিসার জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট স্বাক্ষরিত ব্ল্যাংক ওয়ারেন্ট হাতে নিয়ে বসে থাকে। পুলিশও মোতায়েন করা হয়। পরিকল্পিতভাবে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে বিচারের সম্মুখীন করা হয় যাদের মধ্যে ছিলেন বেণীভূষণ রায়। বিচারের রায়ে পাঁচ হাজার টাকার দু'জন জামিনদারসহ বেণীবাবুকে একবছর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়া হলে বেণীবাবু কলকাতা হাইকোর্টে আপিল করেন। বিচারে বেণীবাবু খালাস পেয়ে যান। বেণীবাবুর এই মামলাটি তৎকালীন রাজনীতিতে বিশেষ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। এটিই ছিল খুলনার প্রথম রাজনৈতিক মামলা। এবং এটিকে কেন্দ্র করেই খুলনার রাজনৈতিক গতিপ্রবাহ ভিন্নখাতে মোড় নেয়।

এরপরে খুলনার স্বদেশি আন্দোলন রীতিমতো বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে পরিণত হয়। ১৯০৮ সালে বিখ্যাত আলিপুর বোমা ষড়যন্ত্র মামলায় যেসকল বিপ্লবী জড়িত ছিলেন তাদের তিনজনই ছিলেন খুলনা শহরের। ভারতের মুক্তি সংগ্রামে খুলনার প্রথম শহিদ চারুচন্দ্র বসু যিনি ১৯০৯ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি আলিপুর কোর্টের পাবলিক প্রসিকিউর আশুতোষ বিশ্বাসকে গুলিতে হত্যা করেন। পরবর্তীকালে খুলনার অপর দুই শহিদভ্রাতার নাম হলো অতুলকুমার সেন এবং অনুজাচরণ সেন। ১৯০৯ সালের জুন মাসের শেষ দিকে বরিশালে যাওয়ার পথে বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ (১৮৭২-১৯৫০) একবার খুলনায় আসেন এবং খুলনায় স্বাধীনতা সংগ্রামের তৎপরতা পর্যবেক্ষণ করেন। এই বছরেই পত্রিকায় দেশাত্মবোধ ও স্বাধীনতার আদর্শ প্রচারের অপরাধে রাজদ্রোহের অভিযোগ এনে বাগেরহাটের 'পল্লীচিত্র' পত্রিকার সম্পাদক বিধুভূষণ বসু (১৮৭৫-১৯৭২) এবং 'খুলনাবাসী' পত্রিকার সম্পাদক গোপালচন্দ্র মুখার্জিকে গ্রেপ্তার করা হয়। খুলনায় বিপ্লবীদের কর্মকাণ্ড পরিচালনার অন্যতম কেন্দ্র হয়ে ওঠে দৌলতপুর হিন্দু একাডেমি (বর্তমান ব্রজলাল কলেজ)। ১৯১২/১৩ সালে এই প্রতিষ্ঠানের কয়েকজন অধ্যাপকের সংস্পর্শে এসে কিছু সংখ্যক ছাত্রও স্বদেশপ্রেমের আদর্শে অনুপ্রাণিত হন। এই সময়েও বাঘা যতীন দৌলতপুর হিন্দু একাডেমিতে যাওয়া আসা এবং অবস্থান করতেন। তার প্রভাবে এখানে একটি গোপন বিপ্লবীকেন্দ্র গড়ে ওঠে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম সশস্ত্র সংগ্রামে রূপ নিতে থাকে। ভারত-রক্ষা আইনে খুলনার বেশ কিছু সংগ্রামীকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পরবর্তী অধ্যায় অসহযোগ আন্দোলন। অহিংস এই আন্দোলনের মূল প্রবক্তা ছিলেন মহাত্মা গান্ধি (১৮৬৯-১৯৪৮)। তাঁর প্রধান সহযোগী ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ (১৮৭০-১৯২৫)। স্বদেশি আন্দোলনের মতো কেবল বিলেতি পণ্য বর্জনের মধ্যেই এই আন্দোলন সীমাবদ্ধ রইলো না বরং এই আন্দোলনের কর্মসূচির মধ্যে ছিল ইংরেজ আদালত ও কাউন্সিল বর্জন, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিত্যাগ ইত্যাদি। আদালত বর্জনের কর্মসূচিতে খুলনার ৫ জন আইনজীবী প্রথম আইনপেশা ত্যাগ করে গান্ধিজীর আদর্শে

দেশসেবায় ব্রতী হন। ভারতের বিভিন্ন স্থানে স্কুল-কলেজে শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত অনেকেই এই পেশা পরিত্যাগ করেন, যাদের মধ্যে খুলনারও কেউ কেউ ছিলেন। কলকাতায় পাঠরত খুলনার ছাত্রদের অনেকেই কলেজ ত্যাগ করে অসহযোগ আন্দোলনে অংশ নেন। এঁদের অগ্রগণ্য ছিলেন পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সেনহাটী গ্রামের সন্তান প্রফুল্লচন্দ্র সেন। দৌলতপুর হিন্দু একাডেমির ছাত্ররাও অসহযোগ আন্দোলনে যুক্ত হন। রাজনৈতিক দর্শন পরিবর্তন করে একটি সময়ে এসে খুলনার মুসলিম সম্প্রদায়ের অনেকেই মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর আদর্শে অনুপ্রাণিত হলেও গান্ধিজীর অসহযোগ আন্দোলনেও তাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল। গান্ধিজী নিজেও একবার খুলনায় আসেন ১৯২৫ সালের ১৭ জুন। পরবর্তীকালে ১৯২৯ সালে গান্ধিজীর সত্যাগ্রহ এবং লবণ আন্দোলনের ঢেউ খুলনায় এসেও আছড়ে পড়ে। শুরু হয় আইন অমান্য আন্দোলন। এই আন্দোলনে সঙ্গত কারণেই নেতৃত্ব দেন কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে ত্বরান্বিত করার জন্য কংগ্রেসের আইনগত আন্দোলন সংগ্রামের পাশাপাশি একটু আইনবহির্ভূত এবং বেপরোয়া ভূমিকা পালনের জন্য অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর, যুবসংঘ প্রভৃতি নামে যে সংগঠনগুলো গড়ে ওঠে সেইসব সংগঠনের বিপ্লবী কর্মকাণ্ডেও সাহসী ভূমিকা পালন করেন খুলনার বিপ্লবী নেতারা এবং ছাত্ররা। দৌলতপুরের সত্যাশ্রমকে কেন্দ্র করে এদের একাংশের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। ১৯৩০ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর যুগান্তর দলের নেতারা খুলনার ইউরোপিয়ান ক্লাব এবং থানার ওপর বোমা হামলা চালায়। কেউ হতাহত না হলেও ঘটনাটি প্রশাসনের রাতের ঘুম এবং দিনের স্বস্তি কেড়ে নেয়। যুগান্তর ও অনুশীলন দলের বিপ্লবী তৎপরতা ক্রমে তীব্র আকার ধারণ করে। সশস্ত্র হতে থাকে। এদের সাথে পরে যুক্ত হয় যুবসংঘ। যুবসংঘে মহিলাকর্মীও ছিলেন। এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ভানুদেবী। পরবর্তীতে পাকিস্তান আমলে নাচোলের তেভাগা আন্দোলনের নেত্রী ইলা মিত্রের (১৯২৫-২০০২) সাথে তেভাগা আন্দোলনের কারণে ভানুদেবীকে একই সেলে কারাবাস করতে হয়েছিল। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে খুলনার নেতাকর্মীরা যে কেবল খুলনাতেই তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতেন তাই-ই নয়, কলকাতায় বসবাসরত এবং শিক্ষারত খুলনার শিক্ষার্থীরাও নানাবিধ কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে মতাদর্শগত সংঘাত শুরু হয়। এই প্রসঙ্গে লেখকের বক্তব্য :

> ত্রিশ দশকের শেষার্ধে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেই সত্যাগ্রহ আন্দোলনের গতি স্তিমিত হয় নানা কারণে। বিপ্লবীদের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনও তখন স্তব্ধ। ইউরোপে যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে, তার রেশ সাম্রাজ্যবাদী নীতি ও ভারতীয় রাজনীতিতেও পড়ে স্বাভাবিকভাবেই। কংগ্রেসের ভেতরে বিভিন্ন শক্তির মধ্যে, কংগ্রেসের বাইরে বিপ্লবী গোষ্ঠীগুলি ও কমুনিস্টদের মধ্যেও নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় ঐ সময়ে। কংগ্রেসের মধ্যে জওহরলাল নেহেরু ও সুভাষচন্দ্র বসু সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা প্রচার করতে থাকেন। ১৯৩৪ সালে নেহেরুর অনুপ্রেরণায় এবং জয়প্রকাশের নেতৃত্বে

> প্রতিষ্ঠিত হয় কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি। ওই পার্টির প্রভাব খুলনা জেলাতেও ছিল, শিবনাথ ব্যানার্জির মতো সক্রিয় নেতার উদ্যোগে জেলায় ওই পার্টির শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই সময়ে খুলনার রাজনৈতিক আন্দোলন ছাত্রদের হাতে চলে যায়। সারা জেলায় তারা তীব্র ছাত্র-আন্দোলন গড়ে তোলেন। যথারীতি দৌলতপুর হিন্দু একাডেমির ছাত্ররা এই আন্দোলনের পুরোভাগে এসে পড়েন। কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের সাথে তীব্র মতবিরোধ এবং অসম্মানের কারণে কংগ্রেস সভাপতির পদে ইস্তফা দিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আন্দোলন গড়ে তোলার জন্যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু (১৮৯৭-১৯৪৫) 'ফরোয়ার্ড ব্লক' গঠন করেন। ভারতবর্ষে রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং তার সাথে সম্পর্কিত বৈশ্বিক পরিস্থিতি আপামর জনসাধারণের কাছে তুলে ধরার জন্য তিনি কয়েকটি জেলায় সফর এবং সভা করার সিদ্ধান্ত নেন। এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে সুভাষচন্দ্র ১৯৩৯ সালের ৩০ ডিসেম্বর খুলনায় আসেন। এর আগে তিনি ১৯২৪ সালে জেলা কংগ্রেস অধিবেশন এবং ১৯৩১ সালে ছাত্র সম্মেলনে সভাপতিত্ব করতে খুলনায় আসেন। ১৯৩৯ সালে সুভাষচন্দ্রের তৃতীয় এবং শেষবার খুলনায় আগমন খুলনার ছাত্র আন্দোলনকে নতুন শক্তি দান করে। তার বক্তব্য ছাত্রদেরকে ভীষণভাবে উদ্দীপ্ত করে। ১৯৪২ সালের ৮ আগস্ট নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বোম্বাই অধিবেশনে গান্ধিজীর পৌরোহিত্যে 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হলে খুলনার সকল শ্রেণি পেশার মানুষ এবং সাধারণ জনগণও এই আন্দোলনে শামিল হয়। 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের কারণে গ্রেপ্তারকৃত নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবিতে তারা ধর্মঘট পালন এবং মিছিল করেন। তথাকথিত অরাজকতা সৃষ্টির অজুহাতে ব্রিটিশ সরকার বেশকিছু নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করে কারাদণ্ড দেয়। অন্যদিকে বাগেরহাটের ছাত্র নেতৃবৃন্দ ভয়ঙ্কর সব পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

> এঁদের গোপন বৈঠক বসত শহরের উপকণ্ঠে বিভিন্ন গ্রামে। শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বাড়িতেও গভীর রাতে মিলিত হয়ে এঁরা কর্মসূচি গ্রহণ সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করতেন; থানা, ট্রেজারি, জেলখানা, সরকারি ভবনগুলির ওপর আক্রমণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। রেললাইন ধ্বংস ও টেলিগ্রাফের তার কেটে দেওয়ার ব্যবস্থাও করা হয়। এই পরিকল্পনা কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে প্রথমেই গঠিত হয় একটি 'অ্যাকশন স্কোয়াড'—বাছাই করা ছাত্রদের নিয়ে।

আন্দোলনের গতিপ্রকৃতির দিকে নজর রাখলে বোঝা যায় যে, ১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকেই খুলনা জেলায় স্বাধীনতা সংগ্রামের ধারা মরণপণ আকার ধারণ করে। ব্রিটিশ সরকারের আক্রমণের বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণের প্রস্তুতি নিতে থাকেন খুলনার রাজনৈতিক নেতা-কর্মীরা। যে চারটি দল বা সংগঠন এই ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে সেগুলো হলো—ফরোয়ার্ড ব্লক, বিপ্লবী সাম্যবাদী দল, সোস্যালিস্ট পার্টি এবং বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল। খুলনা শহরে এসব দলের দুটি গোপন কেন্দ্রও ছিল। বিশেষত বিপ্লবী সাম্যবাদী দলের ওপর গোয়েন্দা পুলিশের

তীক্ষ্ণ নজরদারি ছিল। বিভিন্ন সূত্রে খবর সংগ্রহ করে পুলিশ নেতাকর্মীদের ধরপাকড় করে। বাগেরহাট থানায় বোমা হামলার আসামী ধরার জন্য খুলনা থেকে গোর্খা পুলিশসহ পদস্থ গোয়েন্দা অফিসার প্রেরণ করা হয়। আন্দোলনকারীদের অনেকেই ধরা পড়েন এবং বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। খুলনায় আগস্ট আন্দোলনের সামগ্রিক ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণপূর্বক লেখকের মন্তব্য :

> আগস্ট আন্দোলন যে খুলনায় ব্যাপক আকার নিয়েছিল এবং সরকারি ভবনে অগ্নিসংযোগ ও বোমা নিক্ষেপের বেশ কয়টি ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল, তার উল্লেখ আছে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের নতিপত্রে। এ জন্যই বোধ হয় খুলনার শীর্ষস্থানীয় নেতাদের মুক্তি দেওয়া হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর।

যে দ্বিজাতিতত্ত্বের নিরিখে ভারতবর্ষ বিভক্তিকরণের শর্ত কার্যকরী হওয়ার কথা ছিল সেই শর্তের ব্যতিক্রম ঘটে মুর্শিদাবাদের ভারতভুক্তি এবং খুলনার পাকিস্তানভুক্তির কারণে। কসাইয়ের ছুরিতে মাংসভাগের মতো ব্রিটিশ সরকারের কলমে বিভক্ত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করে ভারতবর্ষ। শেষ হয়ে যায় স্বাধীনতা সংগ্রামও। বিজয় উল্লাসে ক্ষমতালোভী রাজনৈতিক নেতাদের অনেকেই তখন স্বাধীনতা সংগ্রামে সকল মানুষের সামগ্রিক এবং সর্বাত্মক আন্দোলনের গুরুত্ব বিস্মৃত হয়ে যান। ফলে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও আত্মত্যাগ অলিখিত এবং উপেক্ষিত থেকে যায়। আন্দোলনের জাতীয় ইতিহাসের পাতায় কোণঠাসা এমনকী অদৃশ্য হয়ে পড়ে আঞ্চলিক ইতিহাসের উপস্থিতি। ইতিহাসের প্রতি দায়বোধ থেকেই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম ছাত্রকর্মী শ্রীঅজিতকুমার নাগ তার নিজ জেলার সংগ্রামী ইতিহাস লিখেছেন পরম শ্রদ্ধা এবং অপার নিষ্ঠায়। এককালের ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে বেশ খানিকটা দূরে খুলনা এবং খুলনার মফস্বল এলাকাতেও একটি রাষ্ট্রের স্বাধীনতা সংগ্রামে স্থানীয় নেতৃবৃন্দ এবং সাধারণ মানুষও কী বিপুল আত্মপ্রত্যয় এবং দেশাত্মবোধ নিয়ে সংগ্রাম পরিচালনা করেছেন, চরম ত্যাগ স্বীকার করেছেন তার এক উজ্জ্বল দলিল এই গ্রন্থটি। এবং একথা জোর দিয়েই বলা যায় যে, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে খুলনার অবদান বিষয়ক এটিই আজ পর্যন্ত একমাত্র ইতিহাস-গ্রন্থ। অন্তরে কোথায় যেন একটু অভিমান এবং কষ্টের ছোঁয়া রেখে বইটির একেবারে প্রান্তিকপর্বে লেখক লিখেছেন :

> ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম কাহিনি আজ ইতিহাস-বিশ্রুত। আমার এ-কাহিনি শুধু খুলনা জেলাবাসীর সংগ্রাম-গাঁথা, মায়ের কোল ছাড়া মানুষের এই স্মৃতি-ইতিহাসে জড়িয়ে আছে অজস্র বীরের রক্তদান, কারাবাস ও দেশপ্রেমের কাহিনি।

'স্বাধীনতা সংগ্রামে খুলনা' বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮৪ সালে (সেলস এ্যালায়েনস, ৭-বি, লেক প্লেস, কলকাতা-৭০০০২৯)। বইটির আর কোনো সংস্করণের খবর জানা যায় না। বইয়ের লেখকও প্রয়াত হয়েছেন ইতোমধ্যে। বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থে তথ্যসূত্র হিসেবে এই বইটির ব্যাপক উল্লেখ চোখে পড়ে। অনেকেই বইটি খোঁজেন, কিন্তু পান না। অনুসন্ধিৎসু মানুষের আগ্রহের কথা চিন্তা করে বইটি নতুনভাবে প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছেন আমার পরম স্নেহের ছাত্র, কবি

প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী, প্রতিশ্রুতিশীল কবি ও চলচ্চিত্র নির্মাতা, খুলনা যার মানস-জননী, সজল আহমেদ। তাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভাশিস এমন একটি ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনের জন্য। বইটি খুঁজে পেয়েছিলাম খুলনার ব্রজলাল কলেজের দর্শন বিভাগের কৃতী অধ্যাপক, আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, 'ব্রজলাল কলেজের ইতিহাস'সহ বহু গ্রন্থের রচয়িতা প্রফেসর মোঃ বজলুল করিমের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে। এই সুযোগে তাকেও সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। বইটির সম্পাদক হিসেবে দু'টি কথা বিশেষভাবে বলা দরকার যে, কিছু শব্দের বানান এবং ব্যবহার প্রমিতকরণে করা ছাড়া কোথাও লেখকের মৌলিকত্ব বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ন করা হয়নি। এমনকী প্রথম সংস্করণে দু'চারটি অসঙ্গতি যেগুলো চোখে পড়েছে, এতগুলো বছর পরে এসে নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রমাণের অভাবে সেগুলোও সংশোধন করা সম্ভব হয়নি। সেগুলো সেভাবেই রেখে দিতে বাধ্য হয়েছি। শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্রের (১৮৭২-১৯৩১) 'যশোহর-খুলনার ইতিহাস' গ্রন্থটির পাঠ-প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—'ইতিহাস দেশের গৌরব ঘোষণার জন্য নহে, সত্য প্রকাশের জন্য।' শ্রীঅজিতকুমার নাগ 'স্বাধীনতা সংগ্রামে খুলনা' বইটিতে দেশের গৌরব ঘোষণা এবং সত্য প্রকাশ—দুটি কাজই যুগপৎভাবে সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছেন। অজিতকুমার নাগের (জ-১৯২১) জন্মশতবর্ষে গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজো করার মতো বইটি পুনঃ প্রকাশকালে তাঁর পুণ্যস্মৃতির প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

বিভূতিভূষণ মণ্ডল

ইংরেজি বিভাগ
শহীদ আবুল কাশেম কলেজ
কৈয়াবাজার, হরিণটানা
খুলনা।

বিষয়সূচি

প্রথম অধ্যায় ॥ ইতিহাসের আলোয় খুলনা ২১-২৬

দ্বিতীয় অধ্যায় ॥ সংগ্রামের প্রস্তুতিপর্ব ২৭-৩৩

দেশাত্মবোধের উন্মেষ, বঙ্কিম ও সঞ্জীবচন্দ্র, ডঃ কৃষ্ণধন ঘোষ, ত্রিগুণাচরণ সেন, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, প্রথম রাজনৈতিক সংস্থা।

তৃতীয় অধ্যায় ॥ বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশি আন্দোলন ৩৪-৪৪

খুলনায় সুরেন্দ্রনাথ, বরিশাল কন্‌ফারেন্স, কন্‌ফারেন্স থেকে ফিরে, কার্লাইল সার্কুলার, স্বদেশি শিল্প বাণিজ্য।

চতুর্থ অধ্যায় ॥ স্বদেশি আন্দোলনের ক্রমবিকাশ ৪৫-৪৮

ইসলামকাঠি কন্‌ফারেন্স, খুলনা কন্‌ফারেন্স, হাইকোর্টের বিচার।

পঞ্চম অধ্যায় ॥ খুলনায় বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড ১৯০৮-১৯১৭ ৪৯-৭৫

বিপ্লবের প্রথম স্ফুলিঙ্গ, সুধীরকুমার সরকার, ইন্দুভূষণ রায়, বিজয় নাগ, খুলনায় অরবিন্দ, শহিদ চারুচন্দ্র বসু, নাংলা ষড়যন্ত্র মামলা, রাজদ্রোহে অভিযুক্ত দুজন সম্পাদক, দৌলতপুর কলেজ : বিপ্লবী আন্দোলনের পীঠস্থান, সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রয়াস, অভ্যুত্থানের ব্লু প্রিন্ট, বিপ্লবী সতীশচন্দ্র চক্রবর্তীর দুঃসাহসিক কর্মকাণ্ড, সুরেন কুশারীর আত্মাহুতি, স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ, আরও গ্রেপ্তার।

ষষ্ঠ অধ্যায় ॥ অসহযোগ আন্দোলনে খুলনা ৭৬-৮৩

অসহযোগে মুসলমান সম্প্রদায়, স্বরাজ আশ্রম ও সত্যাশ্রম, খুলনায় গান্ধিজী, বাগেরহাট কনফারেন্স।

সপ্তম অধ্যায় ॥ আইন অমান্য আন্দোলনের দিনগুলি ৮৪-৮৮

অষ্টম অধ্যায় ॥ আবার বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড ৮৯-৯৮

যুগান্তর ও কিরণ মুখার্জি, খুলনায় বোমা বিস্ফোরণ, শহিদ অনুজাচরণ সেন, শহিদ অতুলকুমার সেন, যশোর খুলনা যুবসঙ্ঘ, অনুশীলন দল।

নবম অধ্যায় ॥ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও মতাদর্শগত সংঘাত ৯৯-১০২

খুলনায় সুভাষচন্দ্র বসু

দশম অধ্যায় ॥ স্বাধীনতার পথে ১০৩-১০৯

আগস্ট বিদ্রোহ (১৯৪২), তিন দিন তিন রাত।

তথ্য নির্দেশ ১১০-১১৭

পরিশিষ্ট ১১৮-১২৮

ভূমিকা

এই শতাব্দীর প্রথম পর্বেই জঙ্গি জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ ও দেশপ্রেমী যুবকরা উপলব্ধি করেন, শুধু বিদেশি পণ্য বর্জন করেই দেশমাতৃকার বন্ধন মোচন সম্ভব নয়, চাই ইংরেজ শাসনের অবসান। বৃটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের উদ্দেশ্য নিয়ে শুরু হয় নতুন জাতীয়তাবাদী ধারা। ভারতের মুক্তি সংগ্রামে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের পাশাপাশি সশস্ত্র বিপ্লবের এই লড়াই এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। আমাদের খুলনা জেলাতেও এই দুই ধারা সক্রিয় ছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামে খুলনাবাসীর ঐ ভূমিকা তুলে ধরাই এই বইয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য।

১৯৭৯ সালের এপ্রিল মাস থেকে তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু করি, মাঝে মধ্যে শারীরিক অসুস্থতা বাধ সেধেছে। সরকারি নথিপত্র, সংবাদপত্রের পুরনো ফাইল, প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সাথে সাক্ষাৎকার ও আলোচনার ভিত্তিতে জেলার সংগ্রামের ইতিহাস তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। বহু বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী তথ্য ও পরামর্শ দিয়ে আমায় উৎসাহিত করেছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই আজ পরলোকে। তাঁদের কাছে আমার অশেষ ঋণ। যেসব প্রতিষ্ঠান তথ্য ও ফটো সংগ্রহে সাহায্য করেছেন—মহাফেজখানা, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তর, জাতীয় গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, আনন্দবাজার ও অমৃতবাজার পত্রিকার নাম উল্লেখযোগ্য। তথ্য সংগ্রহের পর পাণ্ডুলিপি রচনা শেষ হলে খুলনার বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী ও পশ্চিম বঙ্গের সুপরিচিত রাজনৈতিক নেতা বিদ্যুৎ বসু বইটি প্রকাশ করার দায়িত্ব নিয়ে আমায় কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। ধন্যবাদ জানাই তরুণ বন্ধু ডঃ সজল বসুকে যিনি আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। ধন্যবাদ জানাই প্রভাবতী প্রেসের কর্মীদের যাঁরা অক্লান্তভাবে যথাসময়ে ছাপার কাজ সম্পূর্ণ করেছেন।

খুলনাবাসীর সংগ্রাম ও স্বদেশপ্রীতির রূপরেখা তুলে ধরাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। এই বই পড়ে কেউ যদি জেলার অধিবাসীদের ব্রিটিশ সরকার বিরোধী সংগ্রামের পরিচয় পেয়ে জেলার ঐতিহ্য ও স্বাতন্ত্র্যবোধ সম্বন্ধে গৌরবান্বিত বোধ করেন, তাহলেই আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

১০ আগস্ট, ১৯৮৪

অজিত কুমার নাগ